ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে টমাস জুনিয়রের ভাষণ

ঢাকা, ৮ই জুন-- মান্যবর সভাপতি, উপাচার্য এস.এম.এ. ফায়েজ, অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মণ, সন্মানিত অতিথিবৃন্দ আস্‌সালামুআলাইকুম, নমস্কার এবং শুভ অপরাহ্ন।

এই বিভাগের পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের সাথে অংশ নেয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে কেবল একজন নাগরিক বা কূটনীতিক হিসেবেই নয়, নিজের সন্তানের একজন পিতা হিসেবেও আজ আমি এই অনুষ্টানে এসেছি। সংঘাতময় ও কখনো কখনো অশান্ত এই পৃথিবীতে শান্তির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছুই এখন ঝুঁকির মুখে।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রতিরক্ষা সচিব প্রথমবারের মত বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসভার বেশ কয়েকজন সদস্য, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এবং ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনকে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত আনন্দের সাথে এদেশে স্বাগত জানায়। প্রতিরক্ষা সচিব ডোনাল্ড রামসফেল্ড তাঁর সফরকালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিসকিপিং সাপোর্ট অপারেশনস ট্রেনিং বা বিপসট নামের আঞ্চলিক পর্যায়ের নতুন একটি শান্তিরক্ষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সম্পর্কে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিভিন্ন অসুবিধার কারণে প্রতিরক্ষা সচিবের বিপসট পরিদর্শনের কর্মসুচী আয়োজন করা সম্ভব হয়নি।

তবে এপ্রিল মাসে বিপসটকে সাহায্য করার লক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্টান উদ্বোধন করার আমি সুযোগ পাই। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাওয়ায় বিশ্বব্যাপি শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কতটা সম্পৃক্ত রয়েছে সে সম্পর্কে আমি চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ হই। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা পত্র-পত্রিকায় খুব কমই লেখা হয়ে থাকে। ইরাকে যুদ্ধের বিষয়টি যেভাবে শিরোনাম হয়, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিষয়টি তেমনভাবে উঠে আসে না। বসনিয়া, কসোভো, সোমালিয়া, পূর্ব তিমুরের মত পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে জাতিসংঘের নীল হেলমেট কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন থেকে সক্রিয় রয়েছে। পবিত্র বাইবেলে ম্যাথিউ'র শিক্ষায় বলা হয়েছে, ''শান্তিরক্ষীরা আশীবাদপুষ্ট, কেননা তারা হবেন ঈশ্বরের পুত্র।" আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীদের কার্যক্রমকে বিশেষ করে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে আমি তার প্রশংসা করি। যখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তখনই আমরা এই

উদ্যোগকে সাহায্য করে থাকি। বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের প্রশিক্ষণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর এ পর্যন্ত প্রায় ২.১ মিলিয়ন ডলার অর্থসাহায্য দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে কখনো কখনো শুধু যে ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হয় তাই নয়, এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততাকে বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে শক্তি প্রয়োগ হিসেবে বিবেচনার প্রবণতা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে অবশ্য দেখা যাবে যুক্তরাষ্ট্রের আনুপূর্বিক ইতিহাসে বর্হিবিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখার প্রবণতা খুবই প্রবল ছিল। বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে দুটো বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয় তাতে যুক্তরাষ্ট্রকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই। যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই লক্ষ্য করেছেন আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর আমাদের দেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং সম্ভবত সে কারণেই আধুনিককালে পশ্চিম গোলার্ধের বাইরে বিভিন্ন সংঘাত থেকে মানসিকভাবে আমরা বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছি।

যুক্তরাষ্ট্রে সে সময় অনেকেই বিংশ শতাব্দীর ঐসব বৈশ্বিক যুদ্ধে আমাদের জড়িয়ে পড়ার সমালোচনা করেন। তারা মনে করতেন ঐ যুদ্ধগুলো সময়োপযোগী ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়োপযোগী যুদ্ধ বলতে আদতেই কিছু আছে কি? সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না এবং বিশ্ব যুদ্ধের শুরুতে তাতে জড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতি ছিল না বললেই চলে। ইউরোপে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী তাজা গোলা-বারুদের পরিবর্তে ডামি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করত বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সাধারণ নাগরিকরা যুদ্ধ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে টুকরো লোহা লক্কর এবং রাবারের পুরনো টায়ার সংগ্রহ করত। যুক্তরাষ্ট্রের সমর শক্তিকে ইউরোপ ও এশিয়ার সেনাশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তেমন কার্যকর বলে মনে করা হত না। যেমনটা আমরা সকলেই জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাখ লাখ প্রাণহানি ঘটেছে কেননা যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাল্টা শক্তি ছিল না। ১৯৩৯ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে আমরা খুবই নাজুক অবস্থায় ছিলাম এবং সে সময় আসলেই আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় ছিলাম না। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর পার্ল হারবারে আক্রমণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই প্রথমবারের মত যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং সিদ্ধান্ত নেয় যে সতর্কমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে মনোযোগহীনতার পরিণতিকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না।

শীতল যুদ্ধ নামে পরিচিত প্রায় ৪৫ বছর সময় আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন জনগণের জন্য উন্মুক্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে বিভিন্ন সময় 'সরাসরি যুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ার কতটা কাছাকাছি আমরা চলে এসেছিলাম। কিউবার ক্ষেপনাস্ত্র সমস্যা আমাদেরকে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্তে

নিয়ে গিয়েছিল যার পরিণতি বিশ্ব জুড়েই অনুভূত হতে পারতো। উভয় পক্ষেরই ঠান্ডা মাথার কিছু ব্যক্তি প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ প্রতিহত করতে সাহায্য করেছেন। আর এখন পারমানবিক অস্ত্রভান্ডার যাতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্রের হাতে না পৌছে সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া এবং প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সাথে খুবই সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

সারাবিশ্বে আমেরিকান ও অন্যান্যরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তণ প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন। প্রেসিডেন্ট রিগ্যান শীতল যুদ্ধকালীন নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি এই নীতিতেও বিশ্বাস করতেন যে সংঘাতময় বিশ্বে আগ্রাসন রোধে শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ এড়াতে সক্ষম হয় এবং সেসময় আরো কিছু ইতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হয় যার মধ্যে ছিল ইরানে আমেরিকান জিম্মিদের মুক্তিলাভ। এই সংকটে জিম্মি আটককারীরা যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিমত্তা এবং ইচ্ছা শক্তি উভয়ই পরিমাপ করতে সক্ষম হয় এবং উপলব্ধি করে যে যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ না করাই মঙ্গলজনক।

আমার মনে হয় শীতল যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে অনেকেই ভেবেছিলেন যে শান্তিকালীন সময়ে আমরা সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রস্তুত। সমরকৌশলীরা ''শান্তির সুফল" অর্থাৎ প্রতিরক্ষা খাত থেকে সঞ্চিত অর্থের কথা বলেছেন। শীতল যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধির পরিমাণ অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমরা হয়তো উপলব্ধি করেছিলাম যে নর্থ আমেরিকা ট্রিটি অরগানাইজেশন বা ন্যাটোর মত বড় ধরণের সামরিক জোটের সাথে আমাদের সহযোগিতার সময় শেষ হয়েছে এবং আমরা সংঘাতমুক্ত একটি প্রজন্মের জন্য তৈরি হয়েছি। আমাদের এই ধারণা ঠিক ছিল না। তখন কিংবা এখনো আমরা কাঙ্খিত নির্বাণ লাভ করতে পারি নি।

বরং ১৯৯০ এর দশক ছিল একটা ভয়ঙ্কর সময় যখন শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সংকীর্ণ, সশস্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আল কায়েদা ও অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনের বিস্তার ঘটেছে। আল কায়েদা তার সামরিক শক্তির মাধ্যমে সভ্য সমাজের উপর হিংস্র আক্রমণ করছে এবং তারা মুসলমান ও অমুসলিম জনগোষ্ঠী, সামরিক বাহিনীর সদস্য ও বেসামরিক নিরীহ নাগরিক নির্বিশেষে সবাইকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। আল কায়েদার সদস্যরা নিরপেক্ষদেরও ছেড়ে কথা বলছে না। তারা দুর্বল ও অরক্ষিতদেরকে আক্রমণের শিকার বানাচ্ছে। তারা ইয়েমেন, সৌদি আরব, তানজানিয়া, কেনিয়ার মত আরো অনেক স্থানে যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনার উপর হামলা চালিয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের অনেক আগে থেকেই আল কায়েদা আমাদের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবে এই দিনের সন্ত্রাসী হামলার পরই আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

এ যুগে গণমানসে সন্ত্রাসবাদ এমন প্রভাব ফেলেছে যে আমরা এখন তথাকথিত ''কঠিন" ও ''কোমল" লক্ষ্যবস্তুর কথা বলতে শুরু করেছি। কঠিন লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে রয়েছে সামরিক স্থাপনা, গুদামঘর, বাঙ্কার, যুদ্ধ পরিচালনা ও শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরবরাহ লাইন। কঠিন লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ সামরিক বাহিনী প্রতিহত করতে সক্ষম কেননা দীর্ঘদিন ধরেই সামরিক বাহিনীর কৌশলগত দিক স্বীকৃত।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সুধীবৃন্দের দিকে তাকিয়ে আমি বুঝতে পারছি কোমল লক্ষ্যবস্তু বলতে কি বোঝায়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন- ঘুমানো অবস্থায়, ভ্রমণের সময়, কাজের মাঝে, কর্মস্থলে যাবার সময় অথবা আজকের মত কোন সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সময়- সন্ত্রাসীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারেন। যদি তারা মনে করে যে আপনাকে আঘাত করলে তাদের সুবিধা হবে এবং আঘাত করার মত উপায় তাদের হাতে রয়েছে অথবা তাদের যদি কোন বিবেক না থেকে থাকে তাহলে আপনার জীবন তারা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে। এইসব কোমল লক্ষ্যবস্তুর সংখ্যা সমাজে এত বেশী যে একটা সভ্য সমাজের পক্ষে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে এসব হামলা রোধ করা খুবই কঠিন কাজ

সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্র, প্রাক্তণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, আফগানিস্থান, ইরাক, সৌদি আরব, স্পেন, বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলকে কঠিন ও কোমল উভয় ধরণের হামলা থেকে রক্ষা করার একটি পদক্ষেপ। আর এ কারণেই এটাকে একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই যুদ্ধ আমরা আমাদের নিজেদের পছন্দে শুরু করিনি এবং এই যুদ্ধ আমাদের শর্তেও পরিচালিত হচ্ছে না। কিন্তু একবার যখন আমরা এই যুদ্ধ শুরু করেছি, আমাদেরকে অবশ্যই এর সফল সমাপ্তি পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকতে হবে কেননা এই যুদ্ধে আমাদের হারলে চলবে না। যেমনটা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি, আপনাদের অনেকের মতো আমিও একজন পিতা। আপনাদের মতো আমিও চাই যে বর্তমান অবস্থার থেকে ভিন্ন নিরাপদ ও সুস্থ একটি বিশ্বে আমার কন্যা বেড়ে উঠুক।

আমরা এখন যে বৈশ্বিক যুদ্ধে লিপ্ত আছি সেটা কোন ধর্ম বা সভ্যতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ নয়। এটা প্রথাগত যুদ্ধক্ষেত্রে বিবদমান সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের মতোই আসল যুদ্ধ। সন্ত্রাসীরা এই যুদ্ধ সূচনা করার পর থেকে অধিক সংখ্যায় হতাহত করতে পারলে তাকে তাদের সাফল্য হিসেবে দেখছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে যেমন তারা ২০ জন বাংলাদেশীসহ ৮০টি জাতির ৩,০০০ মানুষকে হত্যা এবং এ বছরের ১১ই মার্চ মাদ্রিদের রেল স্থাপনায় হামলা চালিয়ে ১৮০ জনেরও বেশী মানুষের প্রাণহানির ঘটনাকে নিজেদের সাফল্য হিসেবেই বিবেচনা করছে।

এই যুদ্ধ যখন পরিচালিত হচ্ছে তখন আমাদের সবার মত যারা যুদ্ধ এবং শান্তির বিষয় নিয়ে ভাবিত তাদের কেউই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই

আমরা জানি যে দুষ্ট মানুষেরা যখন কোন খারাপ কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন করতে যায় তখন আমরা অলসভাবে বসে থাকতে পারি না। আমরা এক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না আর কেবল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারি না।

অপরাধ প্রতিরোধ যেমন মানুষের প্রাণহানি বা আহত হওয়া থেকে রক্ষা করা বোঝায় তেমনি যুদ্ধ প্রতিরোধের অর্থ হল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা যে হুমকি সৃষ্টি করেছে সেই হুমকির হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা।

সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং তাদের যারা সাহায্য করে ও আশ্রয় দেয় তাদেরকে চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। কারণ আমরা সবাই জানি যে সন্ত্রাসীরা তাদের নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ সাধারণত ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসীদের ছবি প্রচার এবং তাদেরকে আটক করে বিচারের মুখোমুখি হতে সাহায্য করার বিনিময়ে পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে তথ্য পেতে চায়। বিচার বলতে অবশ্যই আটককৃত যোদ্ধা এবং সন্ত্রাসীদের প্রতি মানবিক আচরণ বোঝায়। নৈতিকতার কিছু মানদ আছে যা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশকে পূরণ করতে হবে। আমরা যখন তা পূরণ করতে ব্যর্থ হই তখন সেই ত্রুটির কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যেমনটা আমরা সম্প্রতি ইরাকে করেছি।

বিখ্যাত পন্ডিত ও দার্শনিক বারুখ স্পিনোজা শতদশ শতকে লিখেছেন,'' যুদ্ধহীন সময়ই শান্তি নয়, এটা একটা বিশেষ গুন, বিশেষ মানসিক অবস্থা, পরহিতৈষণা, আস্থা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার অনুকূল অবস্থা।" ভবিষ্যতে ঝুঁকি ও বিপদ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখলেও শান্তি অর্জিত হবে না। তার ফলে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যায় যেখানে যুদ্ধ অচিন্তনীয়, তাহলেই কেবল শান্তি নিশ্চিত হতে পারে।

যদিও আমার বক্তব্যে সতর্কতা ও সাবধানতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে তবুও আমি আশাবাদী যে আমার শক্তি, অধ্যাবসায় ও তিতিক্ষার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীকে সন্ত্রাসের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারি এবং মুক্ত সমাজের জন্য কাঙ্খিত শান্তি ও স্থিতিশীলতা অর্জনে সক্ষম হতে পারি।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানাতে চাই এমন একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিভাগে সংঘর্ষ ও শান্তিরক্ষার মত আজকের পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ যে একনিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে চলেছে তার সাথে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমি অভিবাদন জানাচ্ছি এবং এই বিভাগের শুভাকাঙ্খী যারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বক্তব্য ধর্য্য ধরে শোনার জন্য।

খোদা হাফেজ।

ধন্যবাদ।